আল কাউসার

১০৮

নামকরণ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এ বাক্যের মধ্য থেকে 'আল কাওসার' শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটি মক্কী সূরা। কাল্‌বী ও মুকাতিল একে মক্কী বলেন। অধিকাংশ তাফসীরকারও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ একে মাদানী বলেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর ইতকান গ্রন্থে এ বক্তব্যকেই সঠিক গণ্য করেছেন। ইমাম মুসলিমও তাঁর শারহে মুসলিম গ্রন্থে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তাঁর মাথা উঠালেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি মুচকি হাসছেন কেন? আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, তিনি নিজেই লোকদের বললেন ঃ এখনি আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে তিনি সূরা আল কাওসারটি পড়লেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, জানো কাওসার কি? সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। বললেন ঃ সেটি একটি নহর। আমার রব আমাকে জান্নাতে সেটি দান করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে সামনের দিকে আল কাওসারের ব্যাখ্যা প্রসংগে।) এ হাদীসটির ভিত্তিতে এ সূরাটিকে মাদানী বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আনাস (রা) মক্কায় নয় বরং মদীনায় ছিলেন। এ সূরাটির মাদানী হবার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তিনি বলেছেন, তাঁর উপস্থিতিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

কিন্তু প্রথমত এটা হযরত আনাস (রা) থেকেই ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে জারীর রেওয়ায়াত করেছেন যে, জান্নাতের এ নহরটি (কাওসার), রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজে দেখানো হয়েছিল। আর সবাই জানেন মি'রাজ মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিজরাতের আগে। দ্বিতীয়ত মি'রাজে যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে কেবলমাত্র এটি দান করারই খবর দেননি বরং এটিকে তাঁকে দেখিয়েও দিয়েছিলেন সেখানে আবার তাঁকে এর সুসংবাদ দেবার জন্য মদীনা তাইয়েবায় সূরা কাওসার নাযিল করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তৃতীয়ত

যদি হযরত আনাসের উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবীগণের একটি সমাবেশে সূরা কাওসার নাযিল হবার খবর দিয়ে থাকেন এবং তার অর্থ এ হয়ে থাকে যে, প্রথমবার এ সূরাটি নাযিল হলো, তাহলে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মতো সতর্ক সাহাবীগণের পক্ষে কিভাবে এ সূরাটিকে মক্কী গণ্য করা সম্ভব? অন্যদিকে মুফাস্সিরগণের অধিকাংশই বা কেমন করে একে মক্কী বলেন? এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করলে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতের মধ্যে একটি ফাঁক রয়েছে বলে পরিষ্কার মনে হয়। যে মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন সেখানে আগে থেকে কি কথাবার্তা চলছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ তাতে নেই। সম্ভবত সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যাপারে কিছু বলছিলেন। এমন সময় অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানানো হলো, সূরা কাওসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর তখন তিনি একথাটি এভাবে বলেছেন ঃ আমার প্রতি এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তাই মুফাস্সিরগণ কোন কোন আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, সেগুলো দু'বার নাযিল হয়েছে। এ দ্বিতীয়বার নাযিল হবার অর্থ হচ্ছে, আয়াত তো আগেই নাযিল হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়বার কোন সময় অহীর মাধ্যমে নবীর (সা) দৃষ্টি এ আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়ে থাকবে। এ ধরনের রেওয়ায়াতে কোন আয়াতের নাযিল হবার কথা উল্লেখ থাকাটা তার মক্কী বা মাদানী হবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত আনাসের এ রেওয়ায়াতটি যদি সন্দেহ সৃষ্টি করার কারণ না হয় তাহলে সূরা কাওসারের সমগ্র বক্তব্যই তার মক্কা মু'আয্যমায় নাযিল হবার সাক্ষ পেশ করে। এমন এক সময় নাযিল হওয়ার সাক্ষ পেশ করে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠিন হতাশা ব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিপূর্বে সূরা দুহা ও সূরা আলাম নাশরাহ–এ দেখা গেছে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তাঁর সাথে শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, বাধার বিরাট পাহাড়গুলো তাঁর পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, চতুর্দিকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ও তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাথী বহুদূর পর্যন্ত কোথাও সাফল্যের কোন আলামত দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ও তাঁর মনে সাহস সঞ্চারের জন্য মহান আল্লাহ বহু আয়াত নাযিল করেন এর মধ্যে সূরা দুহায় তিনি বলেন ঃ

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

"আর অবশ্যি তোমার জন্য পরবর্তী যুগ (অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের পরের যুগ) পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমনসব কিছু দেবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।"

অন্যদিকে আলাম নাশরাহে বলেন ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আর আমি তোমার আওয়াজ বুলন্দ করে দিয়েছি।" অর্থাৎ শত্রু সারা দেশে তোমার দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাদের ইহার বিরুদ্ধে আমি তোমার নাম উজ্জ্বল করার এবং তোমাকে সুখ্যাতি দান করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই সাথে আরো বলেন ঃ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "কাজেই, প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে। নিশ্চিন্তভাবেই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে।" অর্থাৎ বর্তমানে কঠিন অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ো না। শীঘ্রই এ দুখের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাফল্যের যুগ এই তো শুরু হয়ে যাচ্ছে।

এমনি এক অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সূরা কাওসার নাযিল করে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেবার ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়ে দেন। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার অবস্থা হয়ে গেছে একজন সহায় ও বান্ধবহীন ব্যক্তির মতো। ইকরামা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন নবীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন কুরাইশরা বলতে থাকে بتر محمد منا অর্থাৎ "মুহাম্মাদ নিজের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেমন কোন গাছের শিকড় কেটে দেয়া হলে তার অবস্থা হয়। কিছুদিনের মধ্যে সেটি শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়।" (ইবনে জারীর) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কার সরদার আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমির সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উঠলেই সে বলতো ঃ "সে তো একজন আবতার অর্থাৎ শিকড় কাটা। কোন ছেলে সন্তান নেই। মরে গেলে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকবে না।" শিমার ইবনে আতীয়্যার বর্ণনা মতে উকবা ইবনে আবু মু'আইতও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমনি ধরনের কথা বলতো। (ইবনে জারীর) ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে, একবার কাব ইবনে আশরাফ (মদীনার ইহুদি সরদার) মক্কায় আসে। কুরাইশ সরদাররা তাকে বলে ঃ

أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الصَّبِيِّ الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمِهِ يَزْعَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ السِّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ -

"এ ছেলেটির ব্যাপার-স্যাপার দেখো। সে তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে মনে করে, সে আমাদের থেকে ভালো। অথচ আমরা হজ্জের ব্যবস্থাপনা করি, হাজীদের সেবা করি ও তাদের পানি পান করাই।" (বাযযার)

এ ঘটনাটি সম্পর্কে ইকরামা বলেন, কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে الصنبور المنبتر من قومه বলে অভিহিত করতো। অর্থাৎ "তিনি এক অসহায়, বন্ধু-বান্ধবহীন, দুর্বল ও নিসন্তান ব্যক্তি এবং নিজের জাতি থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।" (ইবনে জারীর) ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম (রা) তার ছোট ছিলেন হযরত যয়নব(রা)। তার

ছোট ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা)। তারপর জন্ম নেয় যথাক্রমে তিন কন্যা; হযরত উম্মে কুলসুম (রা), হযরত ফাতেমা (রা) ও হযরত রুকাইয়া (রা)। এদের মধ্যে সর্ব প্রথম মারা যান হযরত কাসেম। তারপর মারা যান হযরত আবদুল্লাহ। এ অবস্থা দেখে আস ইবনে ওয়ায়েল বলে, "তার বংশই খতম হয়ে গেছে। এখন সে আবতার (অর্থাৎ তার শিকড় কেটে গেছে)। কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো একটু বাড়িয়ে আসের এই বক্তব্য এসেছে ঃ

اِنَّ مُحَمَّدًا اَبْتَرُ لاَ ابْنَ لَهُ يَقُوْمُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ فَاِذَا مَاتَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ –

"মুহাম্মাদ একজন শিকড় কাটা। তার কোন ছেলে নেই, যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সে মরে গেলে দুনিয়া থেকে তার নাম মিটে যাবে। আর তখন তোমরা তার হাত থেকে নিস্তার পাবে।"

আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনে আব্বাসের যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আবু জেহেলও এই ধরনের কথা বলেছিল। ইবনে আবী হাতেম শিমার ইবনে আতীয়াহ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোকে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে উকবা ইবনে আবী মু'আইতও এই ধরনের হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। আতা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় পুত্রের ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আবু লাহাব (তার ঘর ছিল রসূলের ঘরের সাথে লাগোয়া) দৌড়ে মুশরিকদের কাছে চলে যায় এবং তাদের এই "সুখবর" দেয় ঃ بُتِرَ مُحَمَّدٌ اللَّيْلَةَ অর্থাৎ রাতে মুহাম্মাদ সন্তানহারা হয়ে গেছে অথবা তার শিকড় কেটে গেছে।"

এ ধরনের চরম হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সূরা কাউসার নাযিল করা হয়। তিনি কেবল আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ কারণে কুরাইশরা ছিল তাঁর প্রতি বিরূপ। এ জন্যই নবুওয়াতলাভের আগে সমগ্র জাতির মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা ছিল নবুওয়াতলাভের পর তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাঁকে এক রকম জ্ঞাতি–গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর সংগী-সাথী ছিলেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। তাঁরাও ছিলেন বন্ধু–বান্ধব ও সহায়–সম্বলহীন। তাঁরাও জুলুম–নিপীড়ন সহ্য করে চলছিলেন। এই সাথে তাঁর একের পর এক সন্তানের মৃত্যুতে তাঁর ওপর যেন দুঃখ ও শোকের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। এ সময় আত্মীয়–স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনাবাণী শুনাবার পরিবর্তে আনন্দ উচ্ছ্বাস করা হচ্ছিল। এমন একজন লোক যিনি শুধু আপন লোকদের সাথেই নয়, অপরিচিত ও অনাত্মীয়দের সাথেও সবসময় পরম প্রীতিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের বিভিন্ন অপ্রীতিকর কথা ও আচরণ তাঁর মন ভেঙে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ অবস্থায় এ ছোট্ট সূরাটির একটি বাক্যে আল্লাহ তাঁকে এমন একটি সুখবর দিয়েছেন যাঁর চাইতে বড় সুখবর দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন দিন দেয়া হয়নি। এই সংগে তাঁকে এ সিদ্ধান্তও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর বিরোধিতাকারীদেরই শিকড় কেটে যাবে।

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

(হে নবী!) আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।[১] *কাজেই তুমি নিজের রবেরই জন্য নামায পড়ো ও কুরবানী করো।*[২] *তোমার দুশমনই*[৩] *শিকড় কাটা।*[৪]

১. কাউসার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে আমাদের ভাষায় তো দূরের কথা দুনিয়ার কোন ভাষায়ও এক শব্দে এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দটি মূলে কাসরাত। كَثْرَةٌ থেকে বিপুল ও অত্যধিক পরিমাণ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সীমাহীন আধিক্য। কিন্তু যে অবস্থায় ও পরিবেশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে শুধুমাত্র আধিক্য নয় বরং কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য এবং এমন ধরনের আধিক্যের ধারণা পাওয়া যায় যা বাহুল্য ও প্রাচুর্যের সীমান্তে পৌঁছে গেছে। আর এর অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা নিয়ামত নয় বরং অসংখ্য কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য। ভূমিকায় আমি এ সূরার যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছি তার ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলানো প্রয়োজন। তখন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শত্রুরা মনে করছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবদিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছেন। জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধু-বান্ধব ও সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশে বাতি জ্বালাবার জন্য যে ছেলে সন্তান ছিল, সেও মারা গেছে। আবার তিনি এমন দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছেন যার ফলে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া মক্কা তো দূরের কথা সারা আরব দেশের কোন একটি লোকও তাঁর কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। কাজেই তাঁর ভাগ্যের লিখন হচ্ছে জীবিত অবস্থায় ব্যর্থতা এবং মারা যাবার পরে দুনিয়ায় তাঁর নাম উচ্চারণ করার মতো একজন লোকও থাকবে না। এ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন বলা হলো, তোমাকে কাওসার দান করেছি তখন স্বাভাবিকভাবে এর মানে দাঁড়ালো : তোমার শত্রুপক্ষীয় নির্বোধরা মনে করছে তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো এবং নবুওয়াত লাভের পূর্বে তুমি যে নিয়ামত অর্জন করেছিলে তা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাকে সীমাহীন কল্যাণ ও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নজিরবিহীন উন্নত নৈতিক গুণাবলী দান করা হয়েছিল সেগুলোও এর অন্তরভুক্ত। তাঁকে যে নবুওয়াত, কুরআন এবং জ্ঞান ও তা প্রয়োগ

করার মতো বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ামত দান করা হয়েছিল তাও এর মধ্যে শামিল। তাওহীদ ও এমন ধরনের একটি জীবন ব্যবস্থার নিয়ামত এর অন্তরভুক্ত যার সহজ, সরল, সহজবোধ্য, বুদ্ধি ও প্রকৃতির অনুসারী এবং পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন মূলনীতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার এবং হামেশা ছড়িয়ে পড়তে থাকার ক্ষমতা রাখে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা ব্যাপকতর করার নিয়ামতও এর অন্তরভুক্ত যার বদৌলতে তাঁর নাম চৌদ্দশো বছর থেকে দুনিয়ার সর্বত্র বুলন্দ হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বুলন্দ হতে থাকবে। তাঁর আহবানে অবশেষে এমন একটি বিশ্বব্যাপী উম্মাতের উদ্ভব হয়েছে, যারা দুনিয়ায় চিরকালের জন্যে আল্লাহর সত্য দীনের ধারক হয়েছে, যাদের চাইতে বেশী সৎ, নিষ্কলুষ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ দুনিয়ার কোন উম্মাতের মধ্যে কখনো জন্ম লাভ করেনি এবং বিকৃতির অবস্থায় পৌঁছেও যারা নিজেদের মধ্যে দুনিয়ার সব জাতির চাইতেও বেশী কল্যাণ ও নেকীর গুণাবলী বহন করে চলছে। এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের চোখে নিজের জীবদ্দশায় নিজের দাওয়াতকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উঠতে দেখেছেন এবং তাঁর হাতে এমন জামায়াত তৈরি হয়েছে যারা সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবার ক্ষমতা রাখতো, এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত। ছেলে সন্তান থেকে বঞ্চিত হবার পর শত্রুরা মনে করতো তাঁর নাম–নিশানা দুনিয়া থেকে মিটে যাবে। কিন্তু আল্লাহ শুধু মুসলমানদের আকারে তাঁকে এমন ধরনের আধ্যাত্মিক সন্তান দিয়েই ক্ষান্ত হননি যারা কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় তাঁর নাম বুলন্দ করতে থাকবে বরং তাঁকে শুধুমাত্র একটি কন্যা হযরত ফতেমার মাধ্যমে এত বিপুল পরিমাণ রক্তমাংসের সন্তান দান করেছেন যারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং মহান নবীর সাথে সম্পর্কই যাদের সবচেয়ে বড় অহংকার। এটিও এ নিয়ামতের অন্তরভুক্ত।

নিয়ামতগুলো আল্লাহ তাঁর নবীকে এ মরজগতেই দান করেছেন। কত বিপুল পরিমাণে দান করেছেন তা লোকেরা দেখেছে। এগুলো ছাড়াও কাউসার বলতে আরো দু'টো মহান ও বিশাল নিয়ামত বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁকে আখেরাতে দান করবেন। সেগুলো সম্পর্কে জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে ছিল না। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সেগুলো সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ কাউসার বলতে দু'টি জিনিস বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে "হাউজে কাউসার" এটি কিয়ামতের ময়দানে তাঁকে দান করা হবে। আর দ্বিতীয়টি "কাউসার ঝরণাধারা।" এটি জান্নাতে তাঁকে দান করা হবে। এ দু'টির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত বেশী হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এত বিপুল সংখ্যক রাবী এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন যার ফলে এগুলোর নির্ভুল হবার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

হাউজে কাউসার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ তথ্য পরিবেশন করেছেন ঃ

এক ঃ এ হাউজটি কিয়ামতের দিন তাঁকে দেয়া হবে। এমন এক কঠিন সময়ে এটি তাঁকে দেয়া হবে যখন সবাই 'আল আতশ' 'আল আতশ' অর্থাৎ পিপাসা, পিপাসা বলে চিৎকার করতে থাকবে সে সময় তাঁর উম্মাত তাঁর কাছে এ হাউজের চারদিকে সমবেত হবে এবং এর পানি পান করবে। তিনি সবার আগে সেখানে পৌঁছবেন এবং তার মাঝ বরাবর জায়গায় বসে থাকবেন। তাঁর উক্তি ঃ هو حوض ترد عليه امتى يوم القيامة

"সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন তার কাছে থাকবে।" (মুসলিম, কিতাবুস সালাত এবং আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ) انا فرطكم على الحوض "আমি তোমাদের সবার আগে সেখানে পৌঁছে যাবো।" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল ও কিতাবুত তাহারাত, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক ও কিতাবুয যুহদ এবং মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىْ اَلْاٰنَ

"আমি তোমাদের আগে পৌঁছে যাবো, তোমাদের জন্য সাক্ষ দেবো এবং আল্লাহর কসম, আমি এ মুহূর্তে আমার হাউজ দেখতে পাচিছ। (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুর রিকাক)।

আনসারদেরকে সম্বোধন করে একবার তিনি বলেন ঃ

اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ

"আমার পরে তোমরা স্বার্থবাদিতা ও স্বজনপ্রীতির পাল্লায় পড়বে। তখন তার ওপর সবর করবে, আমার সাথে হাউজে কাউসারে এসে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।" (বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার ও কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ এবং তিরমিযী কিতাবুল ফিতান।

انا يوم القيمة عند عقر الحوض "কিয়ামতের দিন আমি হাউজের মাঝ বরাবর থাকবো।" (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) হযরত আবু বারযাহ আসলামীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি হাউজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, "একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয়, বারবার শুনেছি। যে ব্যক্তি একে মিথ্যা বলবে আল্লাহ তাকে যেন তার পানি পান না করান।" (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ)। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হাউজ সম্পর্কিত রেওয়ায়াত মিথ্যা মনে করতো। এমন কি সে হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রা), বারাআ ইবনে আযেব (রা) ও আয়েদ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলো অস্বীকার করলো। শেষে আবু সাবরাহ একটি লিপি বের করে আনলেন। এ লিপিটি তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) মুখে শুনে লিখে রেখেছিলেন। তাতে রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহিওয়া সাল্লামের এ বাণী লেখা ছিল ঃ الا ان موعد كم حوضى "জেনে রাখো, আমার ও তোমাদের সাক্ষাতের স্থান হচ্ছে আমার হাউজ।" (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রেওয়ায়াতসমূহ)।

দুই ঃ এ হাউজের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে। তবে অধিকাংশ রেওয়ায়াতে বলা হয়েছেঃ এটি আইলা (ইসরাঈলের বর্তমান বন্দর আইলাত) থেকে ইয়ামনের সান'আ পর্যন্ত অথবা আইলা থেকে এডেন পর্যন্ত কিংবা আম্মান থেকে এডেন পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর এটি চওড়া হবে আইলা থেকে হুজকাহ (জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে একটি স্থান) পর্যন্ত জায়গার সমপরিমাণ। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, আবু দাউদ

তায়ালাসী ৯৯৫ হাদীস, মুসনাদে আহমাদ, আবু বকর সিদ্দীক ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ, মুসলিম–কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, তিরমিযি—আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ এবং ইবনে মাজাহ–কিতাবুয যুহুদ।)। এ থেকে অনুমান করা যায়, বর্তমান লোহিত সাগরটিকেই কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। তবে আসল ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভালো জানে।

তিন ঃ এ হাউজটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কাউসার ঝরণাধারা (সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) থেকে পানি এনে এতে ঢালা হবে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يشخب فيه ميزابان من الجنة এবং অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يعت فيه ميزا بان يمدانه من الجنة অর্থাৎ জান্নাত থেকে দু'টি খাল কেটে এনে তাতে ফেলা হবে এবং এর সাহায্যে সেখান থেকে তাতে পানি সরবরাহ হবে। (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يفتح نهر من الكوثر الى الحوض অর্থাৎ জান্নাতের কাওসার ঝরণাধারা থেকে একটি নহর এ হাউজের দিকে খুলে দেয়া হবে এবং তার সাহায্যে এতে পানি সরবরাহ জারী থাকবে (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

চার ঃ হাউজে কাউসারের অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তার পানি হবে দুধের চাইতে (কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী রূপার চাইতে আবার কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বরফের চাইতে) বেশী সাদা, বরফের চাইতে বেশী ঠাণ্ডা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্টি। তার তলদেশের মাটি হবে মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। আকাশে যত তারা আছে ততটি সোরাহী তার পাশে রাখা থাকবে। তার পানি একবার পান করার পর দ্বিতীয়বার কারো পিপাসা লাগবে না। আর তার পানি যে একবার পান করেনি তার পিপাসা কোনদিন মিটবে না। সামান্য শাব্দিক হেরফেরসহ একথাগুলোই অসংখ্য হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। (বুখারী–কিতাবুর রিকাক, মুসলিম–কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ–ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহ, তিরমিযী–আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ, ইবনে মাজাহ–কিতাবুয যুহোদ এবং আবু দাউদ আত তায়ালাসী, ৯৯৫ ও ২১৩৫ হাদীস।

পাঁচ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাঁর সময়ের লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার তরিকা পদ্ধতি পরিবর্তন করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে এবং এর পানির কাছে তাদের আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, এরা আমার লোক। জবাবে আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি করেছে। তখন আমিও তাদেরকে তাড়িয়ে দেবো। আমি বলবো, দূর হয়ে যাও। এ বক্তব্যটিও অসংখ্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী—কিতাবুল ফিতান ও কিতাবুর রিকাক, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ—ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসসমূহ, ইবনে মাজাহ—কিতাবুল মানাসিক।) ইবনে মাজাহ এ ব্যাপারে যে

হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার শব্দগুলো বড়ই হৃদয়স্পর্শী। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلاَ وَاِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوضِ وَاُكَاثِرُ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تَسْوَدُّوْا وَجْهِىْ اَلاَ وَاِنِّى مُسْتَنْقِذٌ اُنَاسًا وَمُسْتَنقِذٌ اُنَاسٌ مِنِّىْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ –

"সাবধান হয়ে যাও! আমি তোমাদের আগে হাউজে উপস্থিত থাকবো। তোমাদের মাধ্যমে অন্য উম্মাতদের মোকাবিলায় আমি নিজের উম্মাতের বিপুল সংখ্যার জন্য গর্ব করতে থাকবো। সে সময় আমার মুখে কালিমা লেপন করো না। সাবধান হয়ে যাও! কিছু লোককে আমি ছাড়িয়ে নেবো আর কিছু লোককে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হবে। আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার সাহাবী। তিনি বলবেন, তুমি জানো না, তোমার পরে এরা কী অভিনব কাজ কারবার করেছে।" ইবনে মাজার বক্তব্য হচ্ছে, এ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরাফাত ময়দানের ভাষণে বলেছিলেন।

ছয় ঃ এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পর থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময় কালের সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলবে এবং তার মধ্যে রদবদল করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। আমি বলবো ঃ হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মাতের লোক। জবাবে বলা হবে ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি কি পরিবর্তন করেছিল এবং আপনার পথের উল্টোদিকে চলে গিয়েছিল। তখন আমিও তাদেরকে দূর করে দেবো। এবং তাদেরকে হাউজের ধারে কাছে ঘেঁসতে দেবো না। হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অসংখ্য হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী—কিতাবুল মুসাকাত, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, ইবনে মাজাহ—কিতাবুয যুহদ, মুসনাদে আহমাদ–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসসমূহ)।

পঞ্চাশ জনেরও বেশী সাহাবী এ হাউজ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। প্রথম যুগের আলেমগণ সাধারণভাবে এটিকে হাউজে কাউসার বলেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুর রিকাকের শেষ অনুচ্ছেদের শিরোনাম রাখেন নিম্নোক্তভাবে ঃ بَابٌ فِى الْحَوْضِ وَقَوْلُ اللهِ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ (হাউজ অনুচ্ছেদ, আর আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি তোমাকে কাউসার দিয়েছি)। অন্য দিকে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউসার সম্পর্কে বলেছেন ঃ هو حوض ترد عليه امتى "সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মাত সেখানে উপস্থিত হবে।"

জান্নাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউসার নামে যে নহরটি দেয়া হবে সেটির উল্লেখও অসংখ্য হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) থেকে এ সংক্রান্ত

বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে তিনি বলেন (আবার কোন কোনটিতে তিনি স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি হিসেবেই বর্ণনা করেন) ঃ মি'রাজে রসূলুল্লাহকে (সা) জান্নাতে সফর করানো হয়। এ সময় তিনি একটি নহর দেখেন। এ নহরের তীরদেশে ভিতর থেকে হীরা বা মুক্তার কারুকার্য করা গোলাকৃতির মেহরাবসমূহ ছিল। তার তলদেশের মাটি ছিল খাঁটি মিশকের সুগন্ধিযুক্ত। রসূলুল্লাহ (সা) জিব্রীলকে বা যে ফেরেশতা তাঁকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? ফেরেশতা জবাব দেন, এটা কাউসার নহর। আল্লাহ আপনাকে এ নহরটি দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ তায়ালাসী ও ইবনে জারীর। হযরত আনাস এক রেওয়ায়াতে বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, অথবা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ কাউসার কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ একটি নহর যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। এর মাটি মিশকের। এর পানি দুধের চাইতেও সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্টি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর)। মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) নহরে কাউসারের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তার তলদেশে কাঁকরের পরিবর্তে মণিমুক্তা পড়ে আছে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কাউসার জান্নাতের একটি নহর। এর তীরদেশ সোনার তৈরি এবং মণিমুক্তা ও হীরার ওপর প্রবাহিত হচ্ছে। (অর্থাৎ তার তলায় কাঁকরের পরিবর্তে মূল্যবান পাথর বিছানো আছে)। এর মাটি মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। পানি দুধের চাইতে বেশী সাদা। বরফের চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা ও মধুর চেয়ে বেশী মিষ্টি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম, দারামী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আবী শাইবা)। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) একবার হযরত হামযার (রা) বাড়িতে যান। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানদারী করেন। আলাপ আলোচনা করতে করতে এক সময় তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে বলেছেন, আপনাকে জান্নাতে একটি নহর দেয়া হবে। তার নাম কাউসার। তিনি বলেন ঃ "হাঁ, তার যমীন ইয়াকূত, মারজান, যবরযদ ও মতির সমন্বয়ে গঠিত। (ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুইয়া। এ হাদীসটির সূত্র দুর্বল হলেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বিপুল সংখ্যক হাদীস পাওয়া যাওয়ার কারণে এর শক্তি বেড়ে গেছে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের অসংখ্য বক্তব্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এ সবগুলোতে কাউসার বলতে জান্নাতের এ নহরই বুঝানো হয়েছে। ওপরে এ নহরের যে সব বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে এ হাদীসগুলোতেও তাই বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত আয়েশা (রা), মুজাহিদ ও আবুল আলীয়ার উক্তিসমূহ মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. বিভিন্ন মনীষী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ নামায বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ধরেছেন। কেউ ঈদুল আযহার নামায মনে করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, এখানে নিছক নামাযের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে "ওয়ানহার" অর্থাৎ "নহর কর" শব্দেরও কোন কোন বিপুল মর্যাদার অধিকারী মনীষী অর্থ করেছেন, নামাযে বাম হাতের

ওপর ডান হাত রেখে তা বুকে বাঁধা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, নামায শুরু করার সময় দুই হাত ওপরে উঠিয়ে তাকবীর বলা কেউ কেউ বলেছেন, এর মাধ্যমে নামায শুরু করার সময় রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' থেকে উঠে রাফে ইয়াদায়েন করা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, ঈদুল আযহার নামায পড়া এবং কুরবানী করা। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ হুকুম দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এর সুস্পষ্ট অর্থ এই মনে হয় ঃ "হে নবী! তোমার রব যখন তোমাকে এত বিপুল কল্যাণ দান করেছেন তখন তুমি তাঁরই জন্য নামায পড় এবং তাঁরই জন্য কুরবানী দাও।" এ হুকুমটি এমন এক পরিবেশে দেয়া হয়েছিল যখন কেবল কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরাই নয় সমগ্র আরব দেশের মুশরিকবৃন্দ নিজেদের মনগড়া মাবুদদের পূজা করতো এবং তাদের আস্তানায় পশু বলী দিতো। কাজেই এখানে এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুশরিকদের বিপরীতে তোমরা নিজেদের কর্মনীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। অর্থাৎ তোমাদের নামায হবে আল্লাহরই জন্য, কুরবানীও হবে তাঁরই জন্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

"হে নবী! বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব–জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করি।" (আল আন'আম, ১৬২–১৬৩)।

ইবনে আব্বাস, আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী, যাহহাক, রাবী' ইবনে আনাস, আতাউল খোরাসানী এবং আরো অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় মুফাস্‌সির এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন (ইবনে কাসীর)। তবে একথা যথাস্থানে পুরোপুরি সত্য যে, রসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা তাইয়েবায় আল্লাহর হুকুমে ঈদুল আযহার নামায পড়েন ও কুরবানীর প্রচলন করেন তখন যেহেতু ان صلاتى ونسكى আয়াতে এবং فصل لربك وانحر আয়াতে নামাযকে প্রথমে ও কুরবানীকে পরে রাখা হয়েছে তাই তিনি নিজেও এভাবেই করেন এবং মুসলমানদের এভাবে করার হুকুম দেন। অর্থাৎ এদিন প্রথমে নামায পড়বে এবং তারপর কুরবানী দেবে। এটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা বা এর শানেনুযুল নয়। বরং সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিধানটি ইসতেমবাত তথা উদ্ভাবন করেছিলেন। আর রসূলের (সা) ইসতেমবাতও এক ধরনের ওহী।

৩. এখানে شانيك (শা–নিআকা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে شنء (শানউন)। এর মানে এমন ধরনের বিদ্বেষ ও শত্রুতা যে কারণে একজন অন্য জনের বিরুদ্ধে অসদ্ব্যবহার করতে থাকে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا

"আর হে মুসলমানরা! কোন দলের প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন কোন বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ না করে যার ফলে তোমরা ইনসাফ করতে সক্ষম না হও।"

কাজেই এখানে "শানিয়াকা" বলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতায় অন্ধ হয়ে তাঁর প্রতি দোষারোপ করে, তাঁকে গালিগালাজ করে, তাঁকে অবমাননা করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানান ধরনের অপবাদ দিয়ে নিজের মনের ঝাল মেটায়।

৪. هو الابتر "সেই আবতার" বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে তোমাকে আবতার বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই আবতার। আমি ইতিপূর্বে এ সূরার ভূমিকায় "আবতার" শব্দের কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছি। এই শব্দের মূলে রয়েছে বাতারা (بتر) এর মানে কাটা। কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হাদীসে নামাযের যে রাকাতের সাথে অন্য কোন রাকাত পড়া হয় না তাকে বুতাইরা (بتيراء) বলা হয়। অর্থাৎ একক রাকাত। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يَبْدَاُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

"যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রসংশাবাণী উচ্চারণ না করে শুরু করাটা আবতার।"

অর্থাৎ তার শিকড় কাটা গেছে। সে কোন প্রতিষ্ঠা ও শক্তিমত্তা লাভ করতে পারে না। অথবা তার পরিণাম ভালো নয়। ব্যর্থকাম ব্যক্তিকেও আবতার বলা হয়। যে ব্যক্তির কোন উপকার ও কল্যাণের আশা নেই এবং যার সাফল্যের সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে তাকেও আবতার বলে। যার কোন ছেলে সন্তান নেই অথবা হয়ে মারা গেছে তার ব্যাপারেও আবতার শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ তার অবর্তমানে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকে না এবং মারা যাবার পর তার নাম-নিশানা মুছে যায়। প্রায় সমস্ত অর্থেই কুরাইশ কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার বলতো। তার জবাবে আল্লাহ বলেন, হে নবী! তুমি আবতার নও বরং তোমার এ শত্রুই আবতার। এটা নিছক কোন জবাবী আক্রমণ ছিল না। বরং এটা ছিল আসলে কুরআনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতবাণীর মধ্য থেকে একটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার মনে করতো। তখন কেউ ধারণা করতে পারতো না যে, কুরাইশদের এ বড় বড় সরদাররা আবার কেমন করে আবতার হয়ে যাবে? তারা কেবল মক্কায়ই নয় সমগ্র দেশে খ্যাতিমান ছিল। তারা সফলকাম ছিল। তারা কেবল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিল না বরং সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী দল। ব্যবসার ইজারাদার ও হজ্জের ব্যবস্থাপক হবার কারণে আরবের সকল গোত্রের সাথে ছিল তাদের সম্পর্ক। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। হিজরী ৫ সনে আহযাব যুদ্ধের সময় কুরাইশরা বহু আরব ও ইহুদি গোত্র নিয়ে মদীনা আক্রমণ করলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবরুদ্ধ অবস্থায় শহরের চারদিক পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হলো। কিন্তু এর মাত্র তিন বছর পরে ৮ হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা আক্রমণ করলেন

তখন কুরাইশদের কোন সাহায্য–সহযোগিতা দানকারী ছিল না। নিতান্ত অসহায়ের মতো তাদেরকে অস্ত্র সংবরণ করতে হলো। এরপর এক বছরের মধ্যে সমগ্র আরব দেশ ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করতলগত। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে তাঁর হাতে বাই'আত হচ্ছিল। ওদিকে তাঁর শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধু–বান্ধব ও সাহায্য–সহায়হীন হয়ে পড়েছিল। তারপর তাদের নাম–নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে এমনভাবে মুছে গেলো যে, তাদের সন্তানদের কেউ আজ বেঁচে থাকলেও তাদের কেউই আজ জানে না সে আবু জেহেল আর আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়েল বা উকবা ইবনে আবী মু'আইত ইত্যাদি ইসলামের শত্রুদের সন্তান। আর কেউ জানলেও সে নিজেকে এদের সন্তান বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত নয়। বিপরীত পক্ষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের ওপর আজ সারা দুনিয়ায় দরূদ পড়া হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান তাঁর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে গর্ব করে। লাখো লাখো লোক তাঁর সাথেই নয় বরং তাঁর পরিবার–পরিজন এমন কি তাঁর সাথীদের পরিবার পরিজনের সাথেও সম্পর্কিত হওয়াকে গৌরবজনক মনে করে। এখানে কেউ সাইয়েদ, কেউ উলুবী, কেউ আব্বাসী, কেউ হাশেমী, কেউ সিদ্দিকী, কেউ ফারুকী, কেউ উসমানী, কেউ যুবাইরী এবং কেউ আনসারী। কিন্তু নামমাত্রও কোন আবু জেহেলী বা আবু লাহাবী পাওয়া যায় না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবতার নন বরং তাঁর শত্রুরাই আবতার।